গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭২ বর্ষ ৩ সংখ্যা | ১৬ - ২২ আগস্ট ২০১৯ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

৩৭০ ধারা বিলোপ কাশ্মীরের জনগণকে আরও দূরে ঠেলে দেবে, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বাড়তি শক্তি দেবে

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৬ আগস্ট, ২০১৯ এক বিবৃতিতে বলেন,

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের পরামর্শে ভারতের রাষ্ট্রপতির দ্বারা যেভাবে আকস্মিক এক ঘোষণার মাধ্যমে সকল গণতান্ত্রিক নিয়মনীতি পদদলিত করে সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করা হল, জম্মু-কাশ্মীর থেকে লাদাখকে পৃথক করা হল এবং জম্মু-কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নামিয়ে আনা হল, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি তার তীব্র নিন্দা করছে।

স্মরণ করা দরকার যে, ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় কাশ্মীর, যা তখনও একটি স্বাধীন রাজ্য হিসাবে অবস্থান করছিল, তাকে হয় ভারতবর্ষে না হয় পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার অথবা স্বাধীন রাজ্য হিসাবেই থাকার সুযোগ দেওয়া হয়। সে সময় পাক হানাদার বাহিনী কাশ্মীর দখলের জন্য আক্রমণ চালায় এবং কাশ্মীরের একটি অংশে পাকিস্তানের শাসন কায়েম করে। কিন্তু কাশ্মীরের জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে কাশ্মীরের বৃহদংশের জনগণ স্বেচ্ছায় ভারতে যোগদান করে জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের কিছু অধিকার সংরক্ষণের শর্তে, যেগুলি ৩৭০ ধারা হিসাবে ভারতের সংবিধানে যুক্ত করা হয়। এইভাবে জম্মু ও কাশ্মীর ভারত রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়।

তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের প্রয়োজনীয় কর্তব্য ছিল কাশ্মীরের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক পথে সেখানকার জনগণকে জয় করে ধীরে ধীরে সমগ্র দেশের সাথে একাত্মকরণের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা। কিন্তু কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করার পরিবর্তে আমলাতান্ত্রিক উপায়ে কাশ্মীরে শাসন চালায়, ৩৭০ ধারার শর্তাবলিকে ক্রমে লঘু করে দেয়, যা কাশ্মীরের জনগণের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দেয়। যার সুযোগ নিয়েই পাকিস্তান কাশ্মীরকে ভিত্তি করে ভারতের বিরুদ্ধে ছায়াযুদ্ধ শুরু করে দেয় এবং এই পথে জম্মু ও কাশ্মীরের পৃথকতাবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে সর্বাত্মক সমর্থন ও মদত দিতে থাকে। ভারতে একের পর এক কেন্দ্রে কংগ্রেস পরিচালিত সরকারগুলি নিজেদের ভুল সংশোধন করার পরিবর্তে কাশ্মীরের জনগণের উপর নির্মম দমন-পীড়ন চালায়, যা কাশ্মীরের বিরাট অংশের জনসাধারণকে বিরূপ করে তোলে এবং ফলশ্রুতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলির হাতই শক্ত করা হয়। এই পরিস্থিতিতে যখন জরুরি ছিল ৩৭০ ধারার পূর্ণ প্রয়োগ করে কাশ্মীরের জনগণের হৃদয় জয় করা ও তার দ্বারা পাক মদতপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিচ্ছিন্ন ও পরাস্ত করা, তখন হঠাৎ এভাবে ৩৭০ ধারা বাতিল শুধু কাশ্মীরের জনগণকেই আরও দূরে ঠেলে দেবে তাই নয়, বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলিকেও শক্তিশালী হতে সাহায্য করবে। সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা প্রতিবাদী স্বরকে কিছু সময়ের জন্য স্তব্ধ করা যায়, কিন্তু সব সময়ের জন্য করা যায় না, বরং তা বিরোধকে আরও বাড়ায়।

দিল্লির যন্তরমন্তরে বিক্ষোভ। ৮ আগস্ট

সরকারের কাছে আমাদের দাবি, ৩৭০ ধারা সহ কাশ্মীরের জনগণের সকল গণতান্ত্রিক অধিকার অবিলম্বে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। দেশের সকল বাম-গণতান্ত্রিক শক্তি ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণের কাছে আমাদের আহ্বান— বিজেপি সরকারের এই অগণতান্ত্রিক ক্রিয়ার বিরুদ্ধে আপনারা প্রতিবাদে সোচ্চার হোন। কাশ্মীরের জনগণের প্রতি আমাদের আহ্বান, কেন্দ্রীয় সরকারের এই অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের ফলে বিপথচালিত না হয়ে ভারতের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন জনগণের অংশ হয়ে তাঁরাও প্রতিবাদে কণ্ঠ তুলুন।

গণমুক্তির সংকল্প উচ্চারিত হল ১৫ আগস্ট

১৫ আগস্ট প্রথামাফিক দিল্লির লালকেল্লায় পতাকা উত্তোলন করে স্বাধীনতা দিবসের মহৎ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ভাষণ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। স্বাধীনতা? কীসের ও কাদের স্বাধীনতা? কোনও সাম্রাজ্যবাদী দেশের অধীনে ভারতবর্ষ নেই। রাজনৈতিকভাবে আজ দেশ স্বাধীন। কিন্তু ক্ষুদিরাম থেকে শুরু করে ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ সহ অসংখ্য লড়াইয়ে অগণিত শহিদের আত্মবলিদান যা চেয়েছিল— তা কি এই স্বাধীনতা? এ কথাটাই আজ সব চেয়ে বেশি ধাক্কা দিচ্ছে। এই মুহূর্তে যখন স্বাধীনতার ৭২ বার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে তখন দেশজুড়ে মানুষের প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করে পুঁজিপতিদের লুঠের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে এবং লুঠেরাদের প্রত্যক্ষ স্যাঙাতের কাজ করছে শাসক দল সহ সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলি। ইউএপিএ আইনের মারাত্মক সংশোধনের মধ্য দিয়ে সরকারের যে কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে। যদিও কাকে সন্ত্রাসবাদী বলা হবে তার কোনও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহরা যাকে সন্ত্রাসবাদী মনে করবেন তিনিই সন্ত্রাসবাদী প্রতিপন্ন হবেন। পাশাপাশি জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। যার জোরে তারা যে কোনও রাজ্যে গিয়ে সেখানকার সরকারকে অন্ধকারে রেখেও অভিযোগের তদন্ত করতে পারবে ও অভিযোগ তৈরি করবে। এ-ও এক স্বৈরাচারী সংশোধন।

গত সত্তর বছরের পুঁজিবাদী আর্থিক নীতির ফল হিসাবে দেশ জুড়ে যে চরম আর্থিক সঙ্কট নেমে এসেছে তার সমস্ত বোঝা শ্রমজীবী মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে শ্রম আইন আমূল বদলে ফেলে মালিকদের হাতে শ্রমিক শোষণকে আরও তীব্র করার, আরও নির্মম করার অধিকার তুলে দিচ্ছে এই সরকার। বেকারি গত পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ হারে পৌঁছেছে। দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গেছে। অর্থনীতিতে মন্দা এত ব্যাপক রূপ নিয়েছে যে শুধু গাড়ি শিল্পেই ১০ লক্ষ কর্মী ছাঁটাইয়ের

ছয়ের পাতায় দেখুন

কাশ্মীর আবার খবরে তিনের পাতায়

ভারতীয় নবজাগরণের প্রাণপুরুষ
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বি-শত জন্মবর্ষে

- শিক্ষার বেসরকারিকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ ও পণ্যায়নের নীল নক্সা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১৯ ও মেডিকেল শিক্ষায় এনএমসি বিল প্রতিরোধে
- স্কুল স্তরে পাশ-ফেল চালু, পরিবহণে ছাত্র কনসেশন দেওয়া, মদ নিষিদ্ধ করা, বন্ধ চা বাগানের ও কল-কারখানার শ্রমিক সন্তানদের বিনামূল্যে শিক্ষার দাবিতে

৩১ আগস্ট - ২ সেপ্টেম্বর

একাদশতম রাজ্য ছাত্র সম্মেলন

কোচবিহার শহর

উদ্বোধক - ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত
প্রধান অতিথি - কমরেড সৌমেন বসু
প্রধান বক্তা - কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য
সর্বভারতীয় ছাত্র নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখবেন

এ আই ডি এস ও

কমরেড প্রশান্ত ঘটকের জীবনাবসান

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর স্টাফ মেম্বার, কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড প্রশান্ত ঘটক নানা রোগে দীর্ঘকাল গুরুতর অসুস্থ থাকার পর গত ৩১ জুলাই কলকাতার হাতিবাগান সেন্টারে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। ওই দিন তাঁর মরদেহ সংরক্ষিত রাখার পর ১ আগস্ট দলের কেন্দ্রীয় অফিসে নিয়ে আসা হয়। প্রয়াত প্রিয় সহযোদ্ধাকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য কলকাতা, হুগলি, হাওড়া জেলা থেকে কমরেডরা সমবেত হন।

মরদেহে প্রথম মাল্যদান করে বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা জানান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। এরপর পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, কমরেড শঙ্কর সাহা, কমরেড গোপাল কুণ্ডু ও কমরেড সৌমেন বসু শ্রদ্ধা জানান। উপস্থিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা একে একে শ্রদ্ধা জানান। অন্যান্য রাজ্য নেতাদের সাথে বিভিন্ন জেলা কমিটি এবং পার্টি ও গণসংগঠনের ইউনিটগুলির পক্ষ থেকেও মাল্যদান করা হয়। এরপর মরদেহ প্রয়াত কমরেডের প্রধান রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে জেলা কার্যালয়ের উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েকজন কেন্দ্রীয় কমিটির ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সাথে যান। শ্রীরামপুর দলীয় কার্যালয়ে জেলার নেতা-কর্মী-সমর্থকরা মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর শোক মিছিল সহকারে শ্মশানে গিয়ে প্রয়াত কমরেডের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়।

১৯৬০-এর দশকে কমরেড প্রশান্ত ঘটক ছাত্রাবস্থায় এস ইউ সি আই (সি)-র সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। পিতার চাকরির সূত্রে বিভিন্ন জেলায় ঘুরলেও শেষে হুগলিতেই তাঁর পরিবার স্থায়ী হয়। তাঁর পরিবার ছিল সিপিএম দলের সাথে যুক্ত। কমরেড প্রশান্ত ঘটকও তাই ছিলেন। কিন্তু শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক হিসাবে এস ইউ সি আই (সি)-র প্রয়াত নেতা কমরেড সুকোমল দাশগুপ্তের প্রতি ছাত্রদের গভীর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের প্রভাব প্রশান্ত ঘটকের উপরও পড়েছিল। ১৯৬১-৬২ সালের ছাত্রসংসদ নির্বাচনে কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্যকে সভাপতি করে ডিএসও ছাত্র সংসদ গঠন করে। সেইসময় শ্রীরামপুর অঞ্চলে রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেস শক্তিশালী ছিল। তবুও শ্রীরামপুর কলেজ সংসদ নির্বাচনে ডিএসও-র কাছে একাধিকবার পরাস্ত হয়ে ক্ষিপ্ত কংগ্রেস কলেজে কমরেড সুকোমল দাশগুপ্তের উপর হামলা করায়। কলেজের ছাত্ররা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে ও ধর্মঘট করে।

কমরেড প্রশান্ত ঘটকের মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

এই সব ঘটনা ওই কলেজের ছাত্র প্রশান্ত ঘটকের মনের গভীরে ছাপ ফেলে। তদানীন্তন ছাত্র নেতা, বর্তমানে দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ওই সময় কলেজের সংগঠন দেখাশোনার জন্য যাতায়াত করতেন। এই সূত্রেই তাঁর সাথে কমরেড ঘটকের পরিচয় হয়। রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হয়। কিছুদিন আলোচনার পর যে মুহূর্তে কমরেড ঘটক মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে সঠিক বলে উপলব্ধি করলেন, তখনই তিনি অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার, ঘর-বাড়ি সকল কিছু ছেড়ে দলের সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর হাত দিয়েই হুগলি জেলায় দলের সাংগঠনিক কাজকর্মের সূচনা হয়। এজন্য দিন-রাত তিনি পরিশ্রম করেছেন। জেলায় কোনও একজন যোগাযোগের সন্ধান পেলে তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়েছেন। এই সূত্রে জেলার নানা স্থানে বহু পরিবারের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়, বহু বাড়ির দরজা তাঁর জন্য খুলে যায়। বহু ছাত্র-যুব-মহিলা দলে যুক্ত হতে শুরু করেন। এখন হুগলি জেলায় যাঁরা দলের কাজ করেন, তাঁদের অধিকাংশকে তিনিই দলে যুক্ত করেছেন। জেলার শ্রমিক আন্দোলন, গণআন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে তিনি পুলিশি অত্যাচারের শিকার হয়েছেন, কারারুদ্ধও হয়েছেন। সিঙ্গুরের চাষি আন্দোলনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

দল তাঁকে যখন যে দায়িত্ব দিয়েছে তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে তা পালন করেছেন। বীরভূম, বর্ধমান সহ দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলিতে তিনি দলের দ্বারা অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। তত্ত্বগত চর্চা ও জ্ঞান তাঁর ছিল। জটিল তত্ত্ব সহজ ভাষায় তিনি আলোচনা করতে পারতেন। অত্যন্ত সৎ, নির্ভীক, নিবেদিতপ্রাণ এই কমরেড মহান নেতার শিক্ষা, দলের রুচি-সংস্কৃতি ও আচরণবিধি নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করতেন। কোনও নেতার সাথে মতপার্থক্য ঘটলে, তিনি নির্দ্বিধায় তা ব্যক্ত করতে পারতেন।

শেষ দিকে একের পর এক কঠিন রোগের আক্রমণে তাঁর শরীর ভেঙে যায়। যখন আর চলাফেরা করতে পারছেন না, চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে কাজ থেকে বিরত থাকতে বললে তখন দুঃখ পেতেন। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে এক কমরেড তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রশান্তদা কেমন আছেন?' উত্তরে তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে বলেছিলেন, "এভাবে বেঁচে থেকে লাভ কী?" অর্থাৎ কাজ না করতে পারলে বাঁচার প্রয়োজন কী? এই জাতের বিপ্লবী নেতা ছিলেন কমরেড প্রশান্ত ঘটক। তাঁর স্মরণে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সভা ১৪ আগস্ট বিকাল ৪টা। হুগলিতে সভা ১৯ আগস্ট।

শ্রীরামপুরে কমরেড প্রশান্ত ঘটকের শেষযাত্রা

কমরেড প্রশান্ত ঘটক লাল সেলাম

সরকারি গোশালায় শত শত গরুর মৃত্যু

কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোর পুলিশ সম্প্রতি গরু পাচারের অভিযোগে বজরং দলের এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযোগ, ওই ব্যক্তি দিনের বেলায় গোরক্ষা বাহিনীর সক্রিয় কর্মী, রাতের বেলায় গো-পাচারকারী। গরু পাচার নিয়ে এমন টুকরো টুকরো খবর সংবাদপত্রে নানা সময়ে বেরিয়েছে। সেগুলিকে পর পর সাজালে বিজেপি মদতপুষ্ট গোরক্ষকদের 'গোভক্তি' নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই।

১। ত্রিপুরার সিপাহিজলা জেলার বিশালগড় মহকুমায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নামে গোশালা চালাত হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। ওই রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর পরই এই ধরনের গোশালার রমরমা শুরু হয়। ওই গোশালায় ছিল প্রায় ১২০০ গরু। সংবাদে প্রকাশ, অর্ধাহারে, অনাহারে এবং পরিচর্যার অভাবে মাত্র ৪৫ দিনে মারা গেছে প্রায় ৩০০ গরু। সংবাদে এও প্রকাশ, দু'জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যুক্ত রয়েছেন ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথে (সূত্রঃ আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৬-০৭-'১৯)।

২। রাজস্থানে পূর্বতন বিজেপি সরকারের ৫ বছরের শাসনকালে হিঙ্গোনিয়া গোশালায় মারা গিয়েছে ৭৪,০১৬ টি গরু (সূত্রঃ পিটিআই, জানুয়ারি-'১৯)। অর্থাৎ প্রতিদিন মারা গেছে গড়ে ৪০টি গরু।

৩। ছত্তিশগড়ে পূর্বতন বিজেপি সরকারের আমলে 'শাগুন' নামে একটি গোশালায় অল্প কয়েকদিনে ২০০ টি গরু মারা যায়। ওই গোশালাটি চালাতেন স্থানীয় বিজেপি নেতা হরিশ ভার্মা।

৪। রাজস্থানের জালোরে একটি গোশালায় ২০১৭ সালের জুলাই মাসে মারা যায় ৭০০ টি গরু।

৫। উত্তরপ্রদেশের কানপুরে দেশের অন্যতম বৃহৎ একটি গোশালায় ২৮ শতাংশ গরু মারা যায়।

সরকারি টাকায় চলা ওই সমস্ত গোশালার শত শত গো-মৃত্যুর কারণ সবক্ষেত্রেই উপযুক্ত খাদ্য, ওষুধ ও পর্যাপ্ত পরিচর্যার অভাব। গো-কেন্দ্রিক আরেকটি ঘটনার দিকে চোখ ফেরানো যাক। গরু-মোষের মাংস রপ্তানিতে নরেন্দ্র মোদি শাসিত ভারত বিশ্বে প্রথম স্থানাধিকারী। কংগ্রেস আমলের তুলনায় গো-মাংস রপ্তানি বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। সারা বিশ্বের রপ্তানি করা গো-মাংসের প্রায় ২০ শতাংশই হয় ভারত থেকে। আরও খবর হল, এ দেশ থেকে গো-মাংস রপ্তানিকারীদের প্রথম ৬ জনের মধ্যে ৪ জনই হিন্দু।

গো-রক্ষার স্লোগানের আসল উদ্দেশ্য কী? গো-রক্ষকদের উদ্দেশ্য কি সত্যিই গরুদের রক্ষা করা? বাস্তবে গো-রক্ষার নামে গণপিটুনি চালিয়ে, মানুষকে হত্যা করে দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা, অস্থিরতা, ধর্মীয় মেরুকরণ, সংখ্যালঘু জনগণের মধ্যে ভয়ভীতি সৃষ্টি করে, হিন্দু-মুসলিম মেরুকরণ ঘটিয়ে উগ্র হিন্দুত্ববাদী হাওয়া তুলে ভোটে জেতাই হল এদের হীন উদ্দেশ্য। একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত গো-রক্ষকদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন শতাধিক, মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৫০ জনের (সূত্র ঃ ব্লুমবার্গ, ফেব্রুয়ারি ২০১৯)।

স্বামী বিবেকানন্দের কাছে গোরক্ষিণী সভার সদস্যরা এসেছেন গরুর ছবি হাতে। দাবি কসাইয়ের হাত থেকে দেশের সব 'গো-মাতা'কে রক্ষা করাই তাদের ব্রত। বিবেকানন্দ বললেন—দুর্ভিক্ষে দেশের ন'লক্ষ মানুষ মারা গেছেন, তাদের জন্য কী করছেন? উত্তরে সেই গো-রক্ষক বলেন— মানুষ নয়, গো-মাতার সেবা করাই তাদের লক্ষ্য। মানুষ মরে কর্মফলে...। বিবেকানন্দ সহাস্যে বললেন, 'এমন মাতা না হলে এমন সব কৃতী সন্তান প্রসব করল কে?' বিজেপিকে দেখলে তিনি কী বলতেন?

জীবনাবসান

দলের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য ও অল ইন্ডিয়া কিষাণ খেতমজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি কমরেড গোষ্ঠ কুইল্যা দুরারোগ্য লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ৬ আগস্ট ভোরে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

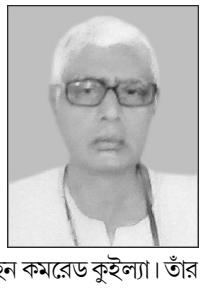

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে নেতা-কর্মী-সমর্থকরা শোকার্ত হৃদয়ে তাঁর বাড়িতে যান, মরদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। '৬০-এর দশকের শেষের দিকে যখন মেদিনীপুর জেলায় দলের কাজ শুরু হয়েছে, তমলুক কলেজে পড়ার সময় এআইডিএসও-র সংস্পর্শে এসে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে আকৃষ্ট হন কমরেড কুইল্যা। তাঁর বাসস্থান সংলগ্ন এলাকা সহ তমলুক ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় তিনি প্রথম দলের সংগঠন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। কৃষক, পানচাষি, তাঁত শিল্পী, বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তুলতে নেতৃত্বকারী ভূমিকা নেন। কর ও মূল্যবৃদ্ধি, বাসভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ ও ভাষা শিক্ষা আন্দোলনে তিনি কয়েকবার গ্রেপ্তার বরণ করেন। তিনি ছিলেন সহজ, সরল, নিরহংকারী, আত্মপ্রচার বিমুখ, অসহায় মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ সম্পন্ন বিরল গুণাবলির অধিকারী।

তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসুর পক্ষে রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দিলীপ মাইতি, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড অনুরূপা দাসের পক্ষে মাল্যদান করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড নন্দ পাত্র। জেলা কমিটির সদস্য, নিমতৌড়ি লোকাল কমিটির সম্পাদক সহ সদস্য-সমর্থক ও বিভিন্ন লোকাল কমিটির সদস্য মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। ২০ আগস্ট বিকাল ৪টায় নিমতৌড়ি সংলগ্ন সুবর্ণরেখা হলে কমরেড গোষ্ঠ কুইল্যার স্মরণসভা।

কমরেড গোষ্ঠ কুইল্যা লাল সেলাম

কাশ্মীর আবার খবরে, কারণ অর্থনীতি আজ কবরে

বিশিষ্ট কৃষি পরিকল্পনাবিদ কল্যাণ গোস্বামীর এই লেখাটি পাঠকদের কাছ থেকে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ই-মেল মারফত আমাদের কাছে আসে। কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি বুঝতে এটি সাহায্য করতে পারে মনে করে তার একাংশ প্রকাশ করা হল।

প্রথমেই বলে রাখি, আমি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে সবার সামনে আজ ইতিহাস এবং সত্যটাকে তুলে ধরছি। দয়া করে আমায় দেশদ্রোহী বা বেইমানের তকমা দেবেন না। আমি আপনার মতোই একজন শিক্ষিত ভারতীয় নাগরিক এবং প্রাণ দিয়ে দেশকে ভালবাসি। তবে মূর্খ হয়ে থেকে বা ভয়ের কারণে মুখ বুঁজে থেকে বিবেকের দংশনে ভুগতে চাই না। তাই এই নিবন্ধ...

বহুচর্চিত ৩৭০ ধারার মাধ্যমে অনেকেই কাশ্মীরকে জানেন। যে ধারা বিলোপ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মুখ্য স্বপ্ন ছিল। পরবর্তীকালে ৬-৭ দশক ধরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস) রাত দিন ৩৭০ ধারা বিলোপের কথা বলে এসেছে। কম বয়সে ছাত্রাবস্থায় স্বল্প জ্ঞানে মনে হত, হয়ত ৩৭০-ই এই দেশের দুর্দশার মূল কারণ। বাকি কোনও সমস্যাই ততটা গূঢ় নয়। আজ বেশ ভালই বুঝি ৩৭০ হচ্ছে কেবল মাত্র একটি পাশার গুটি! আর কিচ্ছু নয়!

...৩৭০ ধারা বহুবার সংশোধনের পরে এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে যেটাকে কপর্দকশূন্য সাবেকি জমিদার গিন্নির গহনার বাক্সের সাথে তুলনা করা যায়। যার মধ্যে একটা সময় অনেক মূল্যবান জিনিস ছিল, কিন্তু এখন সব বেরিয়ে গিয়ে শুধু খালি বাক্সটা পড়ে আছে। সেটা নিয়েই রাজনীতির পসরা খুলে বসেছে সরকার। আর মাদারির ডমরুর তালে অন্ধভক্তি নিয়ে সাথে নেচে চলেছি আমরা ভক্তবৃন্দ। কাশ্মীর সমস্যা আর ৩৭০ ধারা নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করব। তার আগে কিছু জিজ্ঞাসা—

... উগ্রবাদী ছেড়ে দিন গত ৫ বছরে কাশ্মীরে বেশির ভাগ বাচ্চা ছেলে মেয়েরাও নিজেদের হাতে পাথর তুলে নিয়েছে। কাশ্মীর ভ্যালিতে কাজকর্ম ব্যবসা সব ডুবে গেছে। ভ্যালিতে ৭ লক্ষ সৈন্য মোতায়েন করতে হয়েছে। ১০ জন সাধারণ কাশ্মীরি মানুষের পিছনে এক জন্য সৈন্য। তাও কিন্তু পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে। কেন এমন হল?...

আমি ২০১০-'১৩ পর্যন্ত, কাশ্মীরের কৃষি কমিটির মেম্বার ছিলাম। আমার কাশ্মীরে যাওয়াটা ছিল ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করবার মত ব্যাপার। আমি তো রাত বিরেতেও শ্রীনগরে ঘুরে বেড়িয়েছি। কোথাও তো সে সময় অশান্তি বা গাদা খানেক মিলিটারি ঘুরে বেড়াতে দেখিনি। আসলে হাতের উপরে স্থিত ছোট্ট ফোঁড়া চুলকে গত ৫ বছরে ক্যান্সার সৃষ্টি করে, কোনও আলোচনা ছাড়া এখন আপনারা হাতটাকেই এক ঝটকায় কেটে ফেললেন!... হয়ত আপনাদের দ্বারা সম্প্রীতি রক্ষার কাজটি সম্ভব হয়নি, বা রাজনীতির স্বার্থে আপনারা চেয়েই ছিলেন কাশ্মীর উপত্যকার এমন খাস্তা হাল হোক।...

এবার চলুন ইতিহাসে নজর রাখি

আপনি কি জানেন, ভারত স্বাধীন হওয়ার সময়ে কাশ্মীর ভারতের অঙ্গরাজ্য ছিল না? তাহলে কাশ্মীরের ভারতে অন্তর্ভুক্তি হল কী ভাবে? কাশ্মীরের রাজা হরি সিং ১৯৪৭ সালে প্রথমে স্থির করেছিলেন তিনি স্বাধীন থাকবেন এবং সেই মোতাবেক ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে স্থিতাবস্থার চুক্তি স্বাক্ষর করবেন। পাকিস্তান সে চুক্তিতে স্বাক্ষরও করেছিল। কিন্তু জনজাতি এবং সাদা পোশাকের পাক সেনা যখন কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করে, তখন তিনি ভারতের সাহায্য চান, যা শেষপর্যন্ত কাশ্মীরের ভারতভুক্তি ঘটায়। ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর হরি সিং ভারতভুক্তির চুক্তি স্বাক্ষর করেন। পরদিন, ২৭ অক্টোবর ১৯৪৭, গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন সে চুক্তি অনুমোদন করেন। জেনে নেওয়া যাক, ৩৭০ ধারাটি কী ছিল? আর তার তাৎপর্যই বা কী?...

৩৭০ ধারা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ১৯৪৯ সালের ১৭ অক্টোবর। এই ধারা বলে ওই রাজ্যে সংসদের ক্ষমতা ১০০ ভাগ কার্যকরী হয় না। ভারতভুক্তি সহ কোনও কেন্দ্রীয় আইন বলবৎ রাখার জন্য রাজ্য সরকারের অবশ্যই একমত হওয়া আবশ্যক। ১৯৪৭ সালে, ব্রিটিশ ভারতকে ভারত ও পাকিস্তানে বিভাজন করে ভারতীয় সাংবিধানিক আইন কার্যকর হওয়ার সময়কাল থেকেই কোনও প্রিন্সলি স্টেটের ভারতভুক্তির বিষয়টি কার্যকরী হয়। ওই আইনে তিনটি সম্ভাবনার কথা রয়েছে— প্রথমত, স্বাধীন দেশ হিসেবে থেকে যাওয়া, দ্বিতীয়ত, ভারতে যোগদান, অথবা পাকিস্তানে যোগদান।

কী কী শর্তে এক রাষ্ট্রে যোগদান করা হবে, তা রাজ্যগুলি দাবি করে স্থির করতে পারত। যেটা জম্মু কাশ্মীরের ক্ষেত্রেও হয়েছে। এখানে গা জোয়ারির কোনও ব্যাপার ছিল না। অলিখিত চুক্তি ছিল, যোগদানের সময়কালীন প্রতিশ্রুতি রক্ষিত না হলে, দু'পক্ষই নিজেদের পূর্বতন অবস্থানে ফিরে যেতে পারবে। আপনারা জানেন কি, অন্যান্য বেশ কিছু রাজ্য এই বিশেষ সুবিধা ভোগ করে সংবিধানের ৩৭১, ৩৭১-এ থেকে ৩৭১-জে ধারাগুলির মাধ্যমে? তাহলে সে সব রাজ্য নিয়ে কেন কোনও উচ্চবাচ্য নেই? কারণ, ওসব রাজ্যের সাথে 'পাকিস্তান' শব্দটা জড়িয়ে নেই যে। এদেশে আগেও পাকিস্তানের নামে তিন তিন বার ভোট হয়েছে। আপনারা নিজের চোখে দেখেছেন, এই বিগত লোকসভায় পুলওয়ামার দুঃখজনক উগ্রপন্থী আক্রমণ আর নিশানাভ্রষ্ট বালাকোটের উপর ভর করে একটি সরকার ড্যাং ড্যাং করে সিংহাসনে ফিরল। অথচ সরকারি তথ্যই বলছে দেশের চাকুরির অবস্থা গত চল্লিশ বছরের তলানিতে, শিল্পের উন্নয়ন থেমে গেছে, গ্রামীণ অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে।...

... পাকিস্তানের নামেই আমরা সবাই ভাবুক হয়ে অতি দেশপ্রেমীর মত আচরণ করি। অন্য দেশের বিরুদ্ধে খেলায় অতটা বিদ্বেষ থাকে না। কিন্তু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্রিকেট ম্যাচ এদেশে এক একটি মিনি যুদ্ধের রূপ নেয়। অবশ্য পাকিস্তানে গিয়েও দেখেছি, ভারত বিদ্বেষ যেন ওদের মজ্জাগত রোগ। এই রোগাক্রান্ত অনুভবের ফায়দা লোটে দুটি দেশের রাজনৈতিক দলগুলো। তাই কাশ্মীর আর ৩৭০ ধারা গত সাত দশক ধরেই শিরোনামে রয়েছে। অথচ ৩৭১ ধারার সুবিধাভোগী রাজ্যেগুলোর নামও হয়ত আমরা সবাই ঠিক করে বলতে পারব না। কিছু সত্য জেনে রাখুন।...

১. কাশ্মীরের বাইরের লোক কাশ্মীরে জমি কিনতে পারবে না, এই আইন তৈরি হয়েছিল কাশ্মীরি পণ্ডিতদের দাবিতে। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা হরি সিং এই আইন তৈরি করেন, জওহরলাল নেহেরু নন।

২. শুধু কাশ্মীর নয় নাগাল্যান্ড মিজোরাম অরুণাচল সিকিম সহ দেশের ১১ টি রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা ছাড়া বাইরের কেউ জমি কিনতে পারেন না।

৩. পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশেই আদিবাসীদের জমি কেনা যায় না।

৪. সিকিমের অভ্যন্তরীণ কিছু আইনেও ভারতের সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করতে পারে না। সিকিমে ভারতীয় রাষ্ট্রপতি স্রেফ নথিভুক্ত কিছু ব্যাপারেই নাক গলাতে পারেন। বাকি সব ব্যাপারে ওরা সার্বভৌম রাজ্য।

৫. জেনে রাখুন, বিশেষ সুবিধাভোগী রাজ্যগুলিকে সুবিধা দেওয়া হয় বিশেষ বিশেষ কারণে। সেটা দেশ চালাবার একটা স্ট্র্যাটেজি। দেশের অখণ্ডতা ধরে রাখতে এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে, সেগুলো আমি এখানে লিখতে চাই না।

৬. কর্ণাটক রাজ্যের নিজের পতাকা আছে। ওরা অলিখিত ভাবে স্কুল কলেজ পঞ্চায়েত অফিস সর্বত্রই ওদের লাল হলুদ পতাকা উত্তোলন করে। নিজেদের পতাকাকে অফিসিয়াল করবার জন্য ২০১৭ সালে সর্বসম্মতিক্রমে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

আপনি কি মোদি সরকারের ৩ আগস্ট, ২০১৫-র নাগাল্যান্ড চুক্তি সম্পর্কে অবগত? না হলে প্লিজ জেনে নিন, স্বাক্ষরিত এই চুক্তিতে কী কী পয়েন্ট আছে—১. পৃথক নাগা আইন, ২. পৃথক নাগা পতাকা, ৩. নাগা মুদ্রার ব্যবহার, ৪. শুধু নাগারাই রাজ্যে সরকারি চাকুরির যোগ্য। অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্যার, নাগাল্যান্ড চুক্তির বর্ণনা শুনেও কি আপনি স্বর্গে এখনও শান্তিতেই শুয়ে আছেন? এখনও কি আপনার মনে ৩৭০-এর বিদ্বেষ আপনাকে কুরে কুরে খায়?

অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্যার, ৭০ বছর আগে সংসদে যখন ৩৭০ ধারার বিল সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়, আপনি তো দেশের শিল্পমন্ত্রী ছিলেন। তাহলে তখন কেন সেই বিলের বিরোধিতা করেননি? কারণ তখনও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আশাটা হয়ত কিছুটা হলেও বেঁচে ছিল! আমি এটাও জানি, আমার এই লেখাটি প্রকাশিত হলেই আজ উইকিপিডিয়াতে আপনার প্রোফাইলে কিছু পরিবর্তন আসবে। কিন্তু সংসদের নথি ভুল বলে না স্যার, আপনি ৩৭০-এর বিরুদ্ধে সংসদের বিতর্কে সে সময় একটি কথাও সেদিন বলেননি, সেটাই কিন্তু লেখা আছে!

নাহ, আপনার মত বিদ্বান মানুষ নিশ্চয় ভালই জানতেন যে ছোট ছোট প্রিন্সলি স্টেটগুলোকে ভারতে অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টায়, ৩৭০-এর মতো এই দেশের কয়েকটি রাজ্যে ৩৭১ ধারাও আসতে শুরু করেছে। আসলে ৩৭০ ধারা-বিদ্বেষ কেবলমাত্র হিন্দুদের একত্রিত করবার একটি প্ল্যাটফর্ম মাত্র, যা ৩৭১ দিয়ে সম্ভব নয়!

অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্যার শুনে রাখুন, ... প্রচারপ্রেমী আপনিও কিন্তু আপনার আজকের শিষ্যদের থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন না। সারা দেশকে কাশ্মীর আর বিশেষ করে কাশ্মীরি মুসলমান বিদ্বেষী করে তোলার সুনিপুণ কর্মের সূত্রপাত আপনারই হাত দিয়ে। সেটাই খুব দুঃখের ব্যাপার।

...মনে রাখা খুব দরকার, আরএসএস কিন্তু এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশীদার হয়নি। ওরা বসে বসে মজা নিয়েছে। আমার জ্ঞান বর্ধনের জন্য, পারলে একজন শহিদের নাম বলবেন তো, যিনি আরএসএসের ছত্রছায়ায় স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন!...

...আমি মনে করি— জম্মু কাশ্মীরকে ভারতবর্ষে সংযুক্তিকরণের যে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট রয়েছে, এবং বর্তমানে কাশ্মীরকে ঘিরে যে পরিস্থিতি, তার নিরিখে বলা যেতে পারে কাশ্মীরকে টুকরো করে কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল তৈরির সিদ্ধান্ত দেশ এবং দশের স্বার্থে নয়। সংবিধানের ৩৭০ ধারার উপরে খাঁড়ার ঘা হেনে বহুলাংশে বিলুপ্তি ঘটানোর মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রীয়

চারের পাতায় দেখুন

চুপিসারে, গায়ের জোরে ৩৭০ ধারা বাতিলের নিন্দায় সরব কাশ্মীরের পণ্ডিত, ডোগরা ও শিখ বিশিষ্টজনেরা

কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে "চুপিসারে, গায়ের জোর ফলিয়ে" ৩৭০ ধারা বাতিল করল, তার নিন্দা করে জম্মু ও কাশ্মীরের ৬৪ জন বিশিষ্ট নাগরিক সম্প্রতি একটি পিটিশনে স্বাক্ষর করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রখ্যাত চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, নাট্যকর্মী, সাংবাদিক, প্রাক্তন ভাইস এয়ার মার্শাল, গবেষক ও ছাত্রছাত্রীরা, যাঁদের অধিকাংশই কাশ্মীরী পণ্ডিত, ডোগরা ও শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ। সরকারের এই পদক্ষেপকে তাঁরা "অসাংবিধানিক এবং জম্মু-কাশ্মীরের মানুষকে দেওয়া ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতির লংঘন" বলে মন্তব্য করেছেন। পিটিশনে তাঁরা বলেছেন, যেভাবে গণতন্ত্রের সমস্ত রীতিনীতি লংঘন করে রাজ্যের বিধানসভার মতামতের তোয়াক্কা না করে গোপনীয়তার আড়ালে বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নিয়ে জম্মু-কাশ্মীরকে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভেঙে দেওয়া হল, তা কেন্দ্রীয় সরকারের চরম কর্তৃত্ববাদী মানসিকতার প্রকাশ।

পিটিশনে তাঁরা বলেন, "আমরা, জম্মু-কাশ্মীরের জনগণ জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে, আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে, আমাদের অনুমতি ছাড়াই আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্তকে আইনসঙ্গত বলা যায় না। এই একতরফা, অগণতান্ত্রিক এবং অসাংবিধানিক সিদ্ধান্ত যা আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল, আমরা তার নিন্দা করছি ও তা প্রত্যাখ্যান করছি।"

অবিলম্বে জম্মু-কাশ্মীরের উপর অবরোধ জারির পরিস্থিতি হঠিয়ে রাজ্যের মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ অবাধ করতে হবে এবং সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মুক্তি দিতে হবে বলে পিটিশনে দাবি তোলেন তাঁরা।

সবশেষে তাঁরা বলেন, "জন্মভূমির এই বিভাজনে যন্ত্রণাবিদ্ধ আমরা এই সংকটের সময়ে একজোট হয়ে দাঁড়ানোর শপথ নিচ্ছি। জাতপাত, সংস্কৃতি এবং সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে আমাদের মধ্যে বিভাজন ঘটানোর যে কোনও অপচেষ্টা আমরা প্রতিরোধ করব।"

(সূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১১ আগস্ট, ২০১৯)

রাজ্যে রাজ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণসভা

ত্রিপুরা ঃ এস ইউ সি আই (সি) দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এ যুগের অগ্রণী মার্কসবাদী দার্শনিক, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ৪৩ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ৭ আগস্ট আগরতলার যক্ষ্মা নিবারণী সমিতি হলে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। মহান নেতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের মাধ্যমে সভার সূচনা হয়। কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে সঙ্গীত পরিবেশনের পর সভার সভাপতি, দলের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে, রাজ্যে বিজেপি সরকার সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূলের কায়দায় বিরোধীদের শূন্য করে দিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রায় সব আসনই যেভাবে দখল করেছে তার তীব্র সমালোচনা করেন। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং আসাম রাজ্য সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস। তিনি এস ইউ সি আই (সি) দল প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক কারণ তুলে ধরে দলকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। কাশ্মীর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দীর্ঘকাল কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার কাশ্মীরে জনগণের আশা আকাঙক্ষা পূরণ করার পরিবর্তে তাঁদের উপর দমন পীড়ন করেছে। তারই সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানের সহযোগিতায় কাশ্মীরে পৃথকাবাদের জন্ম হয়েছে। বর্তমান কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৩৭০ ধারা বাতিল করে এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে। আসামে এনআরসি-র নামে প্রায় ৪৩ লক্ষ মানুষের অনিশ্চিত জীবনের বর্ণনা তুলে ধরেন তিনি। সর্বশেষে তিনি পুঁজিবাদের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তুলতে উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

আগরতলা, ত্রিপুরা

ওড়িশা ঃ কটক শহরে শহিদ ভবনে ৫ আগস্ট মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস উপলক্ষে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। মাল্যদান এবং শিবদাস ঘোষ স্মরণে সঙ্গীত পরিবেশনের পর ৫ আগস্টের তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড উদ্ধব জেনা। প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দ্বারিকানাথ রথ। ওড়িশায় সংগঠন বিস্তারের ক্ষেত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষের অনন্য ভূমিকার দিকটি তিনি তুলে ধরেন। সভাপতি ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ওড়িশা রাজ্য সম্পাদক কমরেড ধূর্জটি দাস। রাজ্যের বিজেডি সরকার বিজেপি এবং কংগ্রেস থেকে সমদূরত্বের স্লোগান তুলে বাস্তবে যেভাবে কংগ্রেস ও বিজেপির জনবিরোধী নীতিগুলি রাজ্যে কার্যকর করছে তা তুলে ধরে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

কটক, ওড়িশা

১০ আগস্ট। উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে পঞ্চায়েতি মন্দির হলে সভা

ছত্তিশগড় ঃ ৫ আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল ছত্তিশগড়ের দুরগে। এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) -এর ছত্তিশগড় রাজ্য কমিটি আহুত এই সভায় মূল বক্তব্য রাখেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ হাড়োরে। সমাবেশে দুরগ, রায়পুর, ধমতরী, কাঁকোড়, বিলাসপুর ইত্যাদি জেলা থেকে প্রায় সহস্রাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

দুরগ, ছত্তিশগড়

রাজস্থান ঃ ৫ আগস্ট, রাজস্থানের জয়পুরে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সত্যবান। সভাপতিত্ব করেন কমরেড আর ডি চৌধুরী। কমরেড সত্যবান বলেন, খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনে পরিবর্তন ভোটের মাধ্যমে সরকার পাল্টে হবে না, পরিবর্তন আসবে কেবলমাত্র পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

গুনা, মধ্যপ্রদেশ

জয়পুর, রাজস্থান

কাশ্মীর আবার খবরে

তিনের পাতার পর

সরকার কোনও তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দেয়নি। এটা একটা আধমরা বাঘকে মেরে তার সাথে সেলফি নেওয়ার মতো তুচ্ছ ব্যাপার ছাড়া কিছুই নয়। এর আগেই ৩৭০ ধারার নানাবিধ ব্যবস্থাদি আইন সম্মতভাবে দীর্ঘ সময় ধরে লঘু করা হয়েছে। কিন্তু সার্বিক ভাবে জম্মু-কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনের প্রেক্ষাপটে তাদের যে বিশেষ মর্যাদা ছিল সেটাকে খর্ব করে বা সেটাকে নিশ্চিহ্ন করে বর্তমান ঘোষণা শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ। সরকারের এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিজেপির রাজনৈতিক লাভ হয়ত হতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের আন্তর্জাতিক অবস্থানকে এটা মজবুত করবে না। জম্মু-কাশ্মীরের স্পেশাল স্ট্যাটাসকে শেষ করার মধ্যে দিয়ে ভোট বৃদ্ধির লক্ষ্য পূরণ হতে পারে। কিন্তু কোনওভাবেই ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতিকে মজবুত করার কোনও প্রচেষ্টা কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারের ভুলে এবার বেড়াল ঝুলি থেকে বেরিয়েই এলো। এখন ৩৭১ এর সুবিধে গুলো সবাই জানবে, এবং ধীরে ধীরে দেশে ৩৭১-এর সুবিধাভোগী রাজ্যগুলির বিরুদ্ধেও ক্রোধানল বাড়বে। উত্তরপূর্ব ভারতীয় রাজ্যগুলি থেকে আসা লোকেদের উপরে আঘাত বাড়বার যথেষ্টই সম্ভবনা আছে। সার্বিক ভাবে বলতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা বর্তমান পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেলিত করবে এবং যে অগণতান্ত্রিক অসংসদীয় পদ্ধতিতে এই গোটা প্রক্রিয়াটি কার্যত বলপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা হল সেটার ফল হিতে বিপরীত হতেই পারে।

...অবশ্য সাময়িক ভোটের রাজনীতির কথা ভাবলে, এই মাথামোটা পদক্ষেপের চেয়ে ভাল আর কিছু হতেই পারে না। বিশ্বের নজরে আজ ভারতের অঙ্গরাজ্য কাশ্মীরকে অনর্থক একটি মিলিটারি অকুপায়েড টেরিটোরিতে পরিণত করা হল। যেটার আপাতত কোনওই দরকার ছিল না।... ভারত গণরাজ্য থেকে কাশ্মীরকে বের করে আনতে দীর্ঘদিন ধরে যে চেষ্টা হিজবুল, লস্কর বিচ্ছিন্নতাবাদীরা করে আসছিলেন, সংবিধানগত ভাবে দেশ থেকে কাশ্মীরকে এক ঝটকায় কোণঠাসা করে তাদেরই সাহায্য করল এই সরকার। কাশ্মীরের জনগণকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা মনে হয় না আর সম্ভব।... যে এলাকা এতটা সেনসিটিভ, তার দায়িত্ব নাকি থাকবে ঠুনকো, পঙ্গু, ক্ষমতাহীন বিধানসভা আর এক লেফটেন্যান্ট গভর্নরের হাতে। মানে, রাজ্যপালের পদটাও উবে গেছে! ...চোখের সামনে আজ আরো একটি প্যালেস্টাইন সৃষ্টি হল বলেই মনে হয়। যার সুদূর প্রসারী কুফল এদেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম না ভুগলেই ভাল।

মনে রাখতে হবে সরকারের এই আকস্মিক পদক্ষেপ জম্মু-কাশ্মীর সংযুক্তিকরণের ঘোষণাপত্র 'ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাকসেশন'-এর সম্পূর্ণভাবে পরিপন্থী। সরকারের পদক্ষেপ শুধুমাত্র ঐতিহাসিক দিক দিয়ে ভুল তাই নয়, রাজনৈতিক দিক দিয়েও বিভ্রান্তিমূলক। জম্মু-কাশ্মীর ভারতবর্ষের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। গা জোয়ারি না করে, অন্যান্য বিভিন্ন রাজ্যের জন্য সংবিধানের ৩৭১ ধারায় যে সমস্ত ব্যবস্থাদি রয়েছে সেই ব্যবস্থাদির নিরিখেই ৩৭০ ধারার প্রয়োজনীয়তার জায়গাটি দেখা যেতে পারত বা এখনও দেখতে পারা যায়। কাল সকালে উঠে এটা শুনলেও আশ্চর্য হবেন না, যদি রাতারাতি জম্মুর নাম যমুনা নগর, কাশ্মীরের নাম কাশিপুরম, আর লাদাখের নাম লক্ষণপুর করে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার মূল শঙ্কাটা অন্যখানে—

১. যে ভাবে সংসদে আলোচনা ছাড়াই সকাল ১১ টায় সীমিত শব্দে সরকারের পদক্ষেপের তথ্য দিয়েই দায় সারা হয়, সংবিধান বা সংসদের আর কিছু গরিমা রইল কি?

২. সংসদে ঘোষণার ১ ঘন্টার মধ্যেই মহামহিম রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর সহ নোটিশ লোকের হাতে পৌঁছায়। ভয় হয়, রাষ্ট্রপতি কার্যালয় আর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কিছু আর তফাৎ বাকি আছে কি না।

৩. ভয় হয়, আরএসএসের অতীতেও তিরঙ্গা জাতীয় পতাকা অবমাননার ইতিহাস আছে। কে জানে, সংবিধানের গরিমা নষ্ট করাও একটা স্ট্র্যাটেজি কি না! হয়ত আজ থেকেই তার সূত্রপাত হল।

৪. কাল এভাবেই কি অন্য রাজ্যের উপরে খাঁড়ার ঘা নেমে আসতে পারে? খুব আশ্চর্য হব না, যদি একদিন সকালে উঠে শুনতে পাই, বাংলা ভেঙে দু'ভাগ হয়েছে, আজ থেকে দার্জিলিং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বলে পরিগণিত হল, এমন একটা খবর মিডিয়াতে উঠে আসে! এ দেশ সেকুলারিজম বিসর্জন দিয়ে যে ধীরে ধীরে হিন্দুরাষ্ট্র হতে যাচ্ছে, সেটা মূর্খেও বোঝে। সুপ্রিম কোর্টকে কাঁচকলা দেখিয়ে যে এ বছরের মধ্যেই রাম মন্দিরের নামে অধ্যাদেশ আসবে, সেটাও সবার জানা। আন্তর্জাতিক স্তরে ধর্মীয় রাষ্ট্রগুলো বিকাশের যুগে অনেক পিছিয়ে পড়ছে জেনেও আমরা আমাদের সুপ্ত হিন্দুত্বের অ্যাজেন্ডা থেকে এক চুলও সরব না। গোল্লায় যাক দেশটা, যাক না।

পরিশেষে, মনে রাখবেন ১৯৮৪ এর নির্বাচনে কংগ্রেস ৪০৭ টি সিট পেয়েও ১৯৮৯ তে ধসে গেছিল অরুণ নেহেরুর মতো ক্ষমতালোভীর বাড়বাড়ন্তের কারণে। খুব কাছ থেকে জানার সুবাদে, আমি অরুণ নেহেরুর চেহারা, ক্রুরতা, অহংকার আর ক্ষমতালিপ্সার সাথে আজকের দিনে কার যেন ভীষণ মিল খুঁজে পাই! গণতন্ত্রের মার থেকে আজ পর্যন্ত কেউ পার পায়নি! বাকিটা ভবিষ্যৎ বলবে।

সংগ্রামের শপথে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম শহিদ দিবস উদযাপিত

১১ আগস্ট দেশ জুড়ে শত শত স্থানে উদযাপিত হয় স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন ধারার সৈনিক বিপ্লবী ক্ষুদিরামের ১১২তম শহিদ দিবস। কলকাতা হাইকোর্টের সামনে শহিদ ক্ষুদিরামের মূর্তিতে এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস, কমসোমল ও পথিকৃৎ-এর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয় (ছবি)। এসইউসিআই (সি)-র পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ ক্ষুদিরাম মূর্তিতে মাল্যদান করেন। বক্তব্য রাখেন এআইডিএসও-র রাজ্য সহ সভাপতি কমরেড বিপ্লব চন্দ্র। সভাপতিত্ব করেন এআইএমএসএস-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রুনা পুরকায়েত। কমসোমলের পক্ষ থেকে গার্ড অফ অনার জানানো হয়।

এছাড়াও রাজ্যের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, হাট-বাজার-স্টেশন, রাস্তার মোড় সহ বিভিন্ন জনবসতি এলাকায় ছবিতে মাল্যদান, আলোচনাসভার মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হয়।

ঘাটশিলা কলেজে ছাত্রবিক্ষোভ

স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরে আসনসংখ্যা বাড়ানোর দাবিতে ৭ আগস্ট এআইডিএসও-র ঘাটশিলা কলেজ কমিটির পক্ষ থেকে ঘাটশিলা কলেজ গেটে বিক্ষোভ দেখান হাজারখানেক ছাত্রছাত্রী।। কলেজের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং উপাধ্যক্ষের কাছে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সভাপতি কমরেড রিঙ্কি বংসরিয়ার। কলেজ ইউনিটের সম্পাদক কমরেড চন্দনা রানি টুডু এবং সুবোধকুমার মাহালি সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্য ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

মদ ও নারী নির্যাতন বন্ধের দাবিতে কনভেনশন

নারী ও শিশুকন্যাদের উপর ক্রমবর্ধমান নিপীড়নের প্রতিবাদে ১৪ জুলাই মধ্যপ্রদেশের ভোপালে সোনাগিরি কমিউনিটি সভাগৃহে কনভেনশন করল এআইএমএসএস। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড রচনা আগরওয়াল। ভোপালের কয়েকজন শিক্ষক-সমাজকর্মী-ছাত্র-যুবকও বক্তব্য রাখেন। সঞ্চালনা করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা কমরেড ঋতু শ্রীবাস্তব।

৩১ জুলাই ঝাড়খণ্ডের সরাইকেলা-খরসওয়ান জেলায় অনুষ্ঠিত হল মদ ও মাদক বিরোধী মহিলা কনভেনশন (ছবি)। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা এবং এআইএমএসএস নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

বসিরহাটে নানা দাবিতে এস ইউ সি আই (সি)-র বিক্ষোভ

আর্সেনিক মুক্ত পরিস্রুত পানীয় জল, আর্সেনিক আক্রান্তদের সুচিকিৎসা, ১০০ দিনের কাজ সুনিশ্চিত করা, রাস্তা সংস্কার, হিজলা রোডের উভয় পাশে জলনিকাশি ড্রেন, ঘোজাডাঙা থেকে মালঞ্চ পর্যন্ত বাসরুট চালু, মদের দোকান বন্ধ প্রভৃতি দাবিতে ২২ জুলাই এস ইউ সি আই (সি) বসিরহাট লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে বসিরহাট-১ বিডিওকে দাবিপত্র দেওয়া হয়। বসিরহাট ব্রিজের পাশে বিরল প্রজাতির 'নিশিপদ্ম' গাছ বাঁচানো এবং ইটিন্ডা-পাণিতর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের দাবিও জানানো হয়। এদিন বসিরহাট পৌরসভাতেও দাবিপত্র পেশ করা হয়। বসিরহাট টাউন হল এবং রবীন্দ্রভবন অবিলম্বে খোলা, ইছামতী নদীর পাশ দিয়ে বিকল্প রাস্তা তৈরি, শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থার মাস্টার প্ল্যান তৈরি, মাতৃসদনে চিকিৎসা সুনিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। পৌরপিতা সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। পাশাপাশি লোডশেডিং বন্ধ, বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার, মাসিক হিসাবে বিদ্যুৎ বিল দেওয়ার দাবিতে বিদ্যুৎ দপ্তরের ডিভিশনাল ম্যানেজারের দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। বোটঘাটে ব্যাপক বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। নেতৃত্ব দেন কমরেডস অজয় বাইন, নৃপেন মিস্ত্রি, চঞ্চল পালিত, হিরণ্ময় মণ্ডল প্রমুখ।

মোদি জমানার 'গণতন্ত্র' ঃ বিচারপতিকে সরকারের অনুগত হতে হবে

মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদের জন্য গুজরাট হাইকোর্টের সবচেয়ে সিনিয়র বিচারপতি আকিল আব্দুল হামিদ কুরেশির নাম কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম। প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ-এর পাঠানো এই নাম (১০ মে, ২০১৯) বিজেপি সরকার অগ্রাহ্য করে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি রবিশঙ্কর ঝাকে অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ করেছে।

সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি কে হবেন, সেটা ঠিক করার অধিকার কলেজিয়ামেরই। তাহলে কলেজিয়ামের সুপারিশ অনুযায়ী বিচারপতি হামিদ কুরেশিকে কেন প্রধান বিচারপতি করা হল না? সরকার এ বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেনি। তবে কারণটা অনুমান করা শক্ত নয়। কারণ বিচারপতি হামিদ কুরেশি দু'টি মামলায়, নরেন্দ্র মোদি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন গুজরাট সরকার ও অমিত শাহর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন। সোহরাবুদ্দিন ভুয়ো সংঘর্ষ মামলায় অমিত শাহকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছিলেন এবং গুজরাট লোকায়ত নিয়োগ মামলায় সরকারের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন (তথ্যসূত্র ঃ দ্য স্টেটসম্যান, ১ জুন, ২০১৯)। বিচারপতি হামিদ কুরেশি সরকারের অনুগত হননি। ন্যায়বিচারের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। যোগ্যতার মানের নিরিখে সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম যাঁকে প্রধান বিচারপতি পদে নির্বাচিত করেছে সরকার নিয়ম নীতির বাইরে গিয়ে তা অগ্রাহ্য করছে বারবার। ভোটে নির্বাচিত সরকার যখন ক্ষমতার জোরে বেপরোয়া হয়ে নিয়ম ভাঙে তখন সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনের বড় দুর্দিন নেমে আসে। আবারও তার প্রমাণ পাওয়া গেল ২০১৯-এর এপ্রিল মাসে।

আইনজীবী উৎসব সিং বাইন এক হলফনামায় সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে 'গ্যাং অফ ফিকসার্স'-এর কথা উল্লেখ করেছিলেন। অর্থাৎ টাকার বিনিময়ে মামলার শুনানির দিন ও বিশেষ বেঞ্চ ঠিক হচ্ছে। এই হলফনামার শুনানির সময় বিচারপতি অরুণ মিত্র, বিচারপতি আর এফ নরিম্যান এবং বিচারপতি দীপক গুপ্তা বলেন, 'শত শত কোটি টাকার বিনিময়ে মামলার শুনানির দিন ঠিক হচ্ছে'। আজ বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের রাজনীতিতে যেমন মূল্যবোধ-ন্যায়নীতির কোনও বালাই নেই, তেমনি তার ন্যায়ালয়েও মূল্যবোধের চূড়ান্ত অবক্ষয়। অবস্থা এমন রূপ নিয়েছে যে বিচারপতিরাও বলতে বাধ্য হচ্ছেন, টাকাই সব। টাকা দিয়ে বিচারও কেনা যায়। টাকার বিনিময়ে যেমন মালিকের পণ্য বাজারে বিক্রি হয়, মুনাফা ঘরে ওঠে তেমন আজ বিচারও টাকার জোরে কিনে নিতে পারে ধনীরা। বুর্জোয়ারা তাদের 'মহান' ন্যায়বিচার নিয়ে যে মোহ সমাজমননে তৈরি করেছিল, এই হলফনামার শুনানির সময় তার মুখোশ যেন খসে পড়ল। খোদ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা প্রশ্ন করেন, 'এ দেশের ধনী এবং ক্ষমতাবানরা কী মনে করেন, তাঁরা আড়াল থেকে সুপ্রিম কোর্টকে (রিমোট কন্ট্রোল) নিয়ন্ত্রণ করবেন? বলেন, 'আমরা এখন প্রতিদিনই বেঞ্চ ফিক্সিং-এর কথা শুনছি।'

বিস্ময়কর যে, শীর্ষ আদালতের বেঞ্চের এই ভয়ঙ্কর মন্তব্যের পরেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, যিনি ভারত সরকারকে 'স্বচ্ছ' এবং 'দুর্নীতি মুক্ত' বলে দাবি করেন, তিনি সম্পূর্ণ নীরব থাকলেন! যেন সুপ্রিম কোর্টে কিছুই হয়নি, কোনও ঝড় ওঠেনি! আইনমন্ত্রকও প্রধানমন্ত্রীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মূক-বধির সেজেছে।

আইনজীবী বাইন-এর হলফনামার শুনানির দিন কোর্ট দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তের জন্য অবসপ্রাপ্ত বিচারপতি এ কে পট্টনায়ককে দিয়ে ওয়ান ম্যান তদন্ত কমিশন গঠন করেছিল। এখন বলা হচ্ছে, কিছু পুলিশ অফিসার, সুপ্রিম কোর্টের 'বেঞ্চ ফিক্সিং' এবং কোর্ট অর্ডার বদলে দেওয়ার ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি হচ্ছে তা রুখতে নিচুতলার কর্মীদের প্রতি নজর রাখবে। (তথ্যসূত্র ঃ দ্য স্টেটসম্যান, ৮ জুলাই, ২০১৯)

শুধুমাত্র নিচুতলার কর্মীরাই নাকি কোর্ট অর্ডার পাল্টে দিয়ে শিল্পপতি অনিল আম্বানিকে বাঁচিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল! তাই সুপ্রিম কোর্টের দু'জন স্টাফকে বরখাস্ত করেছে কোর্ট। এ এক বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত। এত বড় দুর্নীতির সাথে প্রশাসনের এবং ক্ষমতাবান রাজনীতিকদের কেউ যুক্ত নেই, অনিল আম্বানির কোনও দায় নেই— এ কথা কী বিশ্বাসযোগ্য? বুর্জোয়া বিচারের ভাষায় এরই নাম হল ন্যাচারাল জাস্টিস!

গণতন্ত্র, ন্যায়বিচারের মিষ্টি কথার আড়ালে নিচুতলার কর্মচারী, শোষিত জনসাধারণ বেশিরভাগ সময় ন্যায়বিচারে বঞ্চিত হয়, অবিচারের শিকার হয়। তাই দেখা যায় জেল-হাজতে যারা পাঁচ বা দশ বছর বিনা বিচারে পড়ে আছে, যাদের ফাঁসির সাজা হয়েছে, তাদের মধ্যে সমাজের উঁচুতলার, ক্ষমতাবানদের, অনিল আম্বানিদের কেউ নেই। যেন তারা আইন ভাঙে না, জঘন্য অপরাধ করে না! এটাই হল সংসদীয় গণতন্ত্রের মুখ। বাকিটা মুখোশ। রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে আছে পুঁজিপতি শ্রেণি, উৎপাদনের শক্তি শ্রমিক-চাষি আছে রাষ্ট্র ক্ষমতার বাইরে। স্বাভাবিক কারণে তারা ন্যায়বিচারেরও বাইরে। 'আইন আইনের পথে চলবে' কথাটি যে আজকের এই পুঁজিবাদী সমাজে একটা কথার কথা, তা এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আবারও সামনে এল। আইন আজ অর্থশক্তির বশীভূত, বশীভূত রাষ্ট্রশক্তির কাছেও। যত দিন যাচ্ছে ফ্যাসিবাদী এই প্রবণতা বেড়ে চলেছে।

গণমুক্তির সংকল্প উচ্চারিত হল

একের পাতার পর

মুখে। কাশ্মীরের জনগণের মতামতের কোনও তোয়াক্কা না করে চরম স্বৈরতান্ত্রিক কায়দায় সেখানে ৩৭০ ধারা বাতিল করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে কাশ্মীরের জনগণের প্রতিবাদকে আড়াল করতে কার্ফু জারি করে, মিলিটারি নামিয়ে, ফোন-ইন্টারনেট বন্ধ করে গোটা কাশ্মীর জুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। এই রকম পরিস্থিতিতে ১৫ আগস্ট দেশের মানুষের কাছে কী তাৎপর্য নিয়ে এল?

স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের ভূমিকা

স্বাধীনতার পাঁচ বছর আগে ১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশজোড়া যে ধারাবাহিক সংগ্রামের সূচনা হয়, তা আজাদ হিন্দ সেনাদের গ্রেপ্তার করে বিচারের নামে প্রহসনের প্রক্রিয়া এবং তারই প্রভাবে নৌসেনাদের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে ইংরেজকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করে। সেই ইতিহাস আর একবার দেখে নেওয়া যাক।

১৯৩৯ সালে ১ সেপ্টেম্বর জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর জাপান আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পরের বছর জাপান সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুন দখল করে নেয়। এই অবস্থায় আমেরিকা ব্রিটেনের উপর চাপ দেয় ভারতীয়দের সাথে রফা করে নিতে, যাতে যুদ্ধে ভারতীয়দের সাহায্য পাওয়া যায়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ১৯৪২ সালের ২৩ মার্চ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে পাঠান কতকগুলি প্রস্তাব নিয়ে। যুদ্ধ শেষে স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হবে, এই টোপ দিয়ে ভারতীয়দের এই যুদ্ধে ব্রিটিশের পক্ষে কাজে লাগানোই ছিল ক্রিপস মিশনের উদ্দেশ্য। রাসবিহারী বসু জাপান থেকে এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র জার্মানি থেকে এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করলেন। বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতি, যুদ্ধে জাপানের অগ্রগতি, যুদ্ধের সময়ে বিদেশে রাসবিহারী বসু ও সুভাষচন্দ্র বসুর প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি দেশত্যাগের আগে যুদ্ধের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সংগ্রামের প্রস্তুতির যে আবেদন সুভাষচন্দ্র সারা দেশে সহস্রাধিক জনসভায় জানিয়েছিলেন, জনমনে তার প্রভাব এবং দেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী ধূমায়িত প্রবল অসন্তোষ— সমগ্র পরিস্থিতিকে অগ্নিগর্ভ করে তুলেছিল। কংগ্রেসের নিচের তলায় সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির প্রভাব লক্ষ করে কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হল। স্বাধীনতার দাবিতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেওয়া ছাড়া কংগ্রেস নেতাদের সামনে আর কোনও পথ খোলা থাকল না। ১৯৪২ সালে বোম্বাইতে এআইসিসি অধিবেশনে বিপুল ভোটাধিক্যে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হয়। অথচ কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র এই প্রস্তাব উত্থাপন করলে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্ব সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল।

পরিস্থিতির চাপে কংগ্রেস নেতারা সংগ্রামের ডাক দিলেন বটে কিন্তু সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিলেন না। ইংরেজ ভারত না ছাড়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালানোর জন্য জনতাকে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক থেকে প্রস্তুত করার দরকার ছিল, তা তাঁরা করলেন না। নেতারাও গ্রেপ্তার এড়িয়ে দীর্ঘদিন সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন না। ৯ আগস্ট ভোর রাতেই অধিকাংশ নেতা গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে দেশজুড়ে উত্তাল হয়ে উঠল আন্দোলন। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, বিহার, বাংলা, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা প্রভৃতি রাজ্যের জেলায় জেলায় আন্দোলন ব্যাপক রূপ নিল। কিছু দিনের মধ্যেই এই সংগ্রাম সশস্ত্র গণসংগ্রামের রূপ নিল। বাংলার তমলুক, ওড়িশার বাসুদেবপুর, উত্তরপ্রদেশের বালিয়া, বিহারের ভাগলপুরে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। ব্রিটিশ সরকারের আক্রমণ মোকাবিলা করে কয়েক মাস সেই সরকারগুলি টিকিয়ে রাখল মানুষ। জনতা সারা দেশে পোস্টঅফিস, সরকারি বাড়ি, অফিস হয় দখল করে নিল অথবা পুড়িয়ে দিল। রাস্তা কেটে, রেললাইন উপড়ে, টেলিগ্রাফের তার কেটে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করল দেশের মানুষ। পুলিশ-মিলিটারির সশস্ত্র প্রহরাকে উপেক্ষা করেই নিরস্ত্র জনসাধারণ থানা, সরকারি অফিস, আদালত দখল করার উদ্দেশ্যে অভিযান চালাল। ধেয়ে এল পুলিশী অত্যাচার। নির্বিচারে চলল লাঠি-গুলি। সরকারি উর্দিপরা বাহিনী চালাল ব্যাপক লুঠতরাজ, অসংখ্য মা-বোনকে ধর্ষণ করে এক কলঙ্কময় ইতিহাস রচনা করল। ৯ আগস্ট থেকে পাঁচ মাসে ৬০ হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হল, সাজা দেওয়া হল ২৬ হাজার জনকে। বিনা বিচারে জেলে আটকে রাখা হল ১৮ হাজার জনকে। পুলিশের গুলিতে মারা গেলেন ২৫ হাজার মানুষ। বিদেশ থেকে সুভাষচন্দ্র আন্দোলনকে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে তীব্রতর করার কথা বললেন। কিন্তু এত রক্ত ঢেলেও দেশবাসী দেশের ভেতরে আপসকামী গান্ধীবাদী নেতাদের মন পেল না।

গান্ধীবাদী কংগ্রেস নেতৃত্ব ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে প্রথম থেকেই বিপ্লবী সংগ্রামের বিরোধী ছিল। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন হিংসাত্মক হচ্ছে, এই অভিযোগ তুলে তার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য জেলের মধ্যে গান্ধীজি ২১ দিন অনশন করলেন। জহরলাল ও আবুল কালাম আজাদ আন্দোলনে জনগণের এই সক্রিয় ভূমিকাকে প্রকাশ্যে নিন্দা করলেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দুত্ববাদীদের ভূমিকা

অন্য দিকে হিন্দুত্ববাদী আরএসএস প্রথম থেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' আখ্যা দিয়েছিল। তারাও এই আন্দোলনের বিরোধিতা করল। স্বতঃস্ফূর্ত ও যৌবনোদ্দীপ্ত এই বিদ্রোহকে হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বললেন, "আমি মনে করি না যে, গত তিন মাসের মধ্যে যে সব অর্থহীন উচ্ছৃঙ্খলতা এবং নাশকতামূলক কাজ করা হয়েছে, তার দ্বারা আমাদের দেশের স্বাধীনতা লাভে সহায়তা হবে" (রাষ্ট্র সংগ্রামের এক অধ্যায় —শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়)। মর্যাদায় ভাস্বর এই বিদ্রোহকে শুধু 'উচ্ছৃঙ্খলতা' বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি, বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তিকে অর্থাৎ ব্রিটিশকে সহযোগিতা করার কথাও তিনি বলেছেন। তাঁর ভাষায়— "এখন যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারতবর্ষের ... জাতীয় গভর্নমেন্ট এমন ভাবে গঠিত হবে, যাতে মিত্রপক্ষের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতায় যুদ্ধ করা সম্ভব হয়।" শুধু শ্যামাপ্রসাদই নন, হিন্দু মহাসভার নেতা সাভারকরও বিয়াল্লিশ সালের আন্দোলনের সময় ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ও মুসলিম বিরোধী প্রচারকে তীব্র করতে বলেছিলেন। তাই মহাসভার সদস্যদের স্থানীয় সংস্থায়, আইনসভায়, চাকরিতে যে যেখানে ছিলেন, তাঁদের নিজ নিজ পদ থেকে না সরে

> **স্বতঃস্ফূর্ত ও যৌবনোদ্দীপ্ত এই বিদ্রোহকে (ভারত ছাড়ো) হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বললেন, "আমি মনে করি না যে, গত তিন মাসের মধ্যে যে সব অর্থহীন উচ্ছৃঙ্খলতা এবং নাশকতামূলক কাজ করা হয়েছে, তার দ্বারা আমাদের দেশের স্বাধীনতা লাভে সহায়তা হবে।"**

নিয়মিত নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালন করতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর যুদ্ধকালীন স্লোগান ছিল 'রাজনীতির হিন্দুকরণ' এবং 'হিন্দুত্বের সামরিকীকরণ'। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেয়ে তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে 'হিন্দু জাগরণ'। কিন্তু মানুষের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামী চেতনা সেদিন এতই প্রখর হয়ে উঠেছিল যে তারা হিন্দু মহাসভার নেতাদের এই ফাঁদে পা দেয়নি।

অবিভক্ত সিপিআইয়ের ভূমিকা

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অবিভক্ত সিপিআই-এর (যা ভেঙে পরে সিপিএম এবং নকশালবাদীদের জন্ম) ভূমিকাও ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির শরিক হিসাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে চুক্তি থাকার কারণ দেখিয়ে সিপিআই এ সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করে এবং যুদ্ধে তাদের সব রকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। সিপিআই একটি যথার্থ মার্কসবাদী দল হিসাবে গড়ে উঠতে না পারার কারণে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির সাথে পরাধীন জাতির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের রণকৌশলকে নেতারা গুলিয়ে ফেলেন। এই প্রশ্নে মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ সুস্পষ্ট ভাবে দেখান, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি ও সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বকারী পার্টি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিকতাবাদী দায়িত্ব-কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক হলেও কখনোই এক নয়। সাম্যবাদী বিচারধারা আয়ত্ত না করতে পারার ফলে সিপিআই নেতৃত্ব এই পার্থক্য ধরতে পারেননি। এভাবে সিপিআই একটি মার্কসবাদ বিরোধী ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল ধারা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। জনমানসে কমিউনিজম সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরিতে সহায়তা করে। ১৯৫২ সালে মহান স্টালিন জাতীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে গিয়ে তাদের এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে দাঁড়ানোর নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

ইতিমধ্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের আইএনএ বাহিনীর ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের সংবাদ এ দেশে এসে পৌঁছায়। যার প্রভাবে পুনরায় একটা বিপ্লবী মানসিকতা তৈরি হয়। কিন্তু নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আইএনএ-র এই দেশপ্রেমী সংগ্রামের বিরুদ্ধতা করে সিপিআই, কংগ্রেস এবং আরএসএস। তারা সুভাষচন্দ্রকে 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দেয়।

১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট হিরোসিমায় এবং ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে আমেরিকা পরমাণু বোমা ফেলায় জাপান আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। এর ফলে আইএনএ-ও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের গ্রেপ্তার করে দিল্লিতে আনা হয়। সাথে সাথে নেতাজির নেতৃত্বে আইএনএ-র সমস্ত কর্মকাণ্ড প্রকাশ্যে আসে। দেশজুড়ে জনসাধারণ নেতাজি ও আইএনএ-র প্রতি ভালবাসায় ও আবেগে আপ্লুত হয়। ব্রিটিশ বাহিনীর অভ্যন্তরে ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। ৫ নভেম্বর সারা দেশ আজাদ হিন্দ পতাকা দিবস পালন করে। সেনাদের বিচার শুরু হওয়ার পর সারা দেশে গণবিক্ষোভ উত্তাল হয়ে ওঠে। তা এতখানি তীব্র হয় যে সরকার শুনানি স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়। গণবিক্ষোভের সঙ্গে তাল মেলাতে এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতায় জনমনে কংগ্রেস সম্পর্কে যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল তা প্রশমিত করতে কংগ্রেস নেতারা আইএনএ সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য পাল্টে ফেলেন। যে জহরলাল একদিন নেতাজিকে যুদ্ধ-অপরাধী হিসাবে বিচার করার কথা বলেছিলেন, তিনিই আইএনএ-র পক্ষে দাঁড়িয়ে যান।

এরই প্রভাবে ১৯৪৫ সালে মুম্বইয়ে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর ভারতীয় সেনারা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু শেষপর্যন্ত কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ যুক্তভাবে নৌবিদ্রোহ নিরস্ত করতে ঘৃণ্য ভূমিকা নেয়। কংগ্রেস নেতৃত্বের দ্বারা প্রতারিত হয়ে নৌসেনারা বিদ্রোহ তুলে নিলে ব্রিটিশ সরকার বিদ্রোহী সেনাদের গুলি করে হত্যা করে। সমগ্র দেশে এ নিয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়। ইতিমধ্যে মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাসিস্ট শক্তিকে পরাস্ত করে এবং মহান মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে চীনের মুক্তিবাহিনীর বিপুল জয়ের সংবাদ এ দেশের জনমনে কমিউনিজমের প্রতি প্রবল আবেগ সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় পুঁজিবাদ, জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগ দ্রুত ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ মেনে নিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে। স্বাধীন ভারতে সরকারে বসে কংগ্রেস।

দীর্ঘ কংগ্রেস শাসনে পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে শ্রমিক-কৃষক সহ সাধারণ মানুষের স্বার্থকে তারা পদদলিত করেছে। কংগ্রেস সরকারের নীতিতে একদিকে পুঁজিপতি শ্রেণির শোষণ তীব্রতর করারব্যবস্থা পাকা হয়েছে, অন্য দিকে একের পর এক কালা আইন জারি করে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির সাথে আপস করা হয়েছে। আমলাতন্ত্র গেড়ে বসেছে। সরকার এবং প্রশাসন দুর্নীতিতে ছেয়ে

আটের পাতায় দেখুন

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী আগতপ্রায়। সেই উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে শিক্ষাগ্রহণের জন্য।

(৬)

পরোপকার করতে পারলে বিদ্যাসাগরের আনন্দের সীমা থাকত না

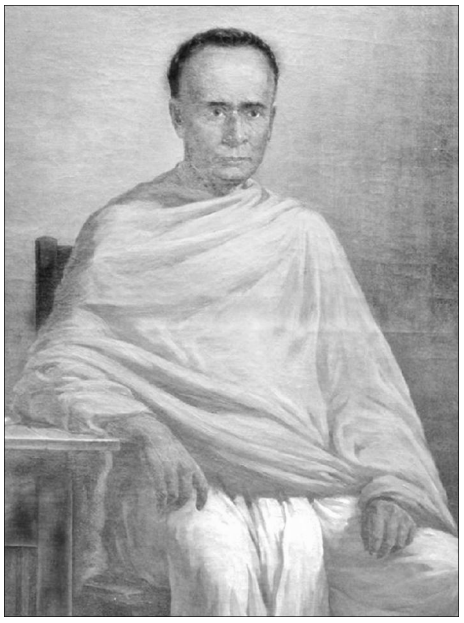

ঈশ্বরচন্দ্র তখন ছাত্র, জগদ্দুর্লভ সিংহের বাড়িতে থাকতেন তিনি। একদিন জগদ্দুর্লভ সিংহের একজন পরিচিত লোক এসে বলল, তার চেনা এক পরিবারের সকলের কলেরা হয়েছে। তারা খুবই গরিব। চিকিৎসা করার কোনও উপায় নেই। বালক ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে দাঁড়িয়ে ঘটনাটি শুনলেন, মনে মনে ভীষণ কষ্ট হল তাঁর। কাউকে কিছু না বলে সন্ধ্যায় একাই সেই বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দেখলেন বাড়ির পাঁচজনেই শয্যাশায়ী। জল পিপাসায় খুবই কাতর, জল দেওয়ারও কেউ নেই। মাঝে মাঝে বমি ও মলত্যাগ করছে। সেগুলো পরিষ্কার করারও কেউ নেই। বাড়ি ফেরার কথা ভুলে গেলেন বালক ঈশ্বরচন্দ্র। অন্য একটি বাড়ি থেকে এক কলসি জল আনলেন। চকমকি ঠুকে প্রদীপ জ্বাললেন। সকলকে জল খাইয়ে ডাক্তার ডাকতে গেলেন। রাস্তায় ডাক্তার রূপচাঁদবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ডাক্তারের পরামর্শে ও সাহায্যে ময়লা পরিষ্কারের জন্য সরকারের নিযুক্ত মহিলাকে ডেকে এনে বমি ও মল পরিষ্কার করিয়ে সারা রাত জেগে বসে থেকে, রোগীদের বারে বারে জল দিতে লাগলেন। ক্রমে তিনটি শিশু কথা বলল। অত্যন্ত আনন্দ হল তাঁর। পরিশ্রম সার্থক বলে মনে হল। রাত্রি শেষ হলে স্ত্রীলোকটি বললেন— 'বাবা, তুমি সমস্ত রাত জেগে বড় কষ্ট পেয়েছ, একবার বাবুদের বৈঠকখানায় শুয়ে পড়। বাবুরা খুব ভদ্রলোক।'

স্ত্রীলোকটি ভাবলেন, এমন দয়াময় বালক না ঘুমিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁদেরকে আর কে দেখবে?

সকালে ঈশ্বরচন্দ্র মিছরি ও বেদানা পথ্য দিয়ে ফিরে এলেন। বাড়িতে ফেরার পথে গঙ্গার ঘাটে স্নান করে নিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বয়সে ছোট হলেও জানতেন গৃহস্থ জগদ্দুর্লভবাবু যদি শোনেন যে তিনি কলেরা রোগীর সেবা করে এসেছেন তা হলে রাগ করবেন। কলেরা মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ। সেকালে এ রোগের তেমন ওষুধও ছিল না। একবার একজনকে ধরলে গোটা এলাকায় মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ত। অনেকেই মারা যেত। তাই নিকট আত্মীয়ের কলেরা হলেও ভয়ে কেউ তার ধারে কাছে যেত না। তাকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যেত। সারারাত ধরে এরকম মারাত্মক কলেরা রোগীর সেবা করে, স্নান সেরে বাজার করে ঈশ্বরচন্দ্র বাড়ি ফিরলেন।

এদিকে তাঁকে বাসায় না পেয়ে বাবা ও ভাইয়েরা খোঁজ করছেন। ফিরে এলে বাবা জিজ্ঞেস করলেন—'কাউকে কিছু না বলে কাল রাত্তিরে কোথায় ছিলি? বেলা হল দেখে আমি মধুসূদনের বাসায় খুঁজতে গিয়েছিলাম। সে বলল, কাল তুই তাঁর সাথে দেখা করিসনি। সে আরও বলল, এ অঞ্চলে কলেরা রোগ ছড়িয়েছে। হয়তো কারও অসুখের খবর পেয়ে তুই তার সেবা শুশ্রূষার জন্য গিয়েছিস। বলল, ঈশ্বরের মন দয়ায় খুবই আচ্ছন্ন। পরোপকার করতে পারলে তার আনন্দের সীমা থাকে না। এ কথা শুনে আমি ফিরে এলাম। কী ব্যাপার বল দেখি?'

ঈশ্বরচন্দ্র চুপ করে থাকলেন। ঠাকুরদাসও ছেলেকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। রান্না খাওয়া শেষ হলে ভাই দীনবন্ধুকে ঈশ্বরচন্দ্র বললেন— 'কলেজে গিয়ে আমাদের শ্রেণির অধ্যাপককে বলবি, দাদা আজ এক স্থানে অসুখের খবর পেয়ে তাঁদের সেবা শুশ্রূষার জন্য গিয়েছেন। তাঁরা খুবই গরিব, তাই দাদা আসতে পারেননি।' এই কথা বলে আবার ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, রোগীরা অনেকটা সুস্থ।

মানুষের প্রতি বিদ্যাসাগরের ছিল এমনি গভীর ভালবাসা। কোনও বাছবিচার না করেই দুঃস্থ, অসহায় মানুষকে সাহায্য করতেন। এ জন্যই ছেলেবেলায় তাঁকে সকলে ডাকত 'দয়াময়' বলে। পরবর্তী জীবনে তাঁর 'করুণাসাগর' নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

বিদ্যাসাগর যখন বউবাজারের বাসায় থাকতেন, তখন বাসার পাশে থাকতেন মোক্তার বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর এক ভৃত্যের কলেরা হয়। মোক্তারবাবু ভয়ে চাকরের হাত ধরে রাস্তায় শুইয়ে দেন। খবরটা কানে গেল বিদ্যাসাগরের, চোখের জল ফেলতে ফেলতে ছুটে গেলেন তিনি। ভৃত্যটিকে কোলে তুলে এনে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলেন। নিজে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনলেন। মল ও বমি পরিষ্কার করে সারাক্ষণ বসে থেকে শুশ্রূষা করলেন। তাঁর পরিচর্যায় ৫-৭ দিন পরে সেরে উঠল।

বিহারীলাল সরকার লিখেছেন— 'স্বদেশি হউক, বিদেশি হউক, ব্রাহ্ম হউক, খ্রিস্টান হউক, মুসলমান হউক, সাহসী, সদালাপী, সরল সত্যসন্ধ ব্যক্তিমাত্রেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয় অধিকার করিতেন, কিন্তু পরের জন্য তিনি রোদন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। দরিদ্রের দুঃখ দর্শনে তাঁহার হৃদয় টলিত, বান্ধবের মরণশোক তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইত।'

এত বড় মানবদরদি মন ছিল বলেই বর্ধমান জেলায় যখন একবার ম্যালেরিয়া মহামারী রূপে দেখা দিয়েছিল তখন তিনি চুপ করে থাকতে পারেননি। খবর পেলেন অসংখ্য মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। বিদ্যাসাগর অবিলম্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। ম্যালেরিয়া কবলিত এলাকায় অস্থায়ী দাতব্য চিকিৎসালয় খুললেন। নিজেই গরিব রোগীদের চিকিৎসা, পথ্যের তদারকি করতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ধর্ম বর্ণ ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে। এলাকার অধিকাংশ মানুষই ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। সে সময় হিন্দুধর্মের মধ্যে জাতপাতের ছোঁয়াছুঁয়ির বাছবিচার ছিল প্রবল। তখন ব্রাহ্মণ হয়েও বিদ্যাসাগর মুসলমান পরিবারের অসুস্থ মরণাপন্ন একটি শিশুকে পরম যত্নে কোলে তুলে নিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন, এমনই মায়ের মতো কোমল মন ছিল তাঁর।

নিম্ন শ্রেণির লোক, কম বেতনের কর্মচারী, ভৃত্য বা পরিচারক শ্রেণির কেউ, পদমর্যাদায় তাঁর চেয়ে অনেক নিচের কোনও মানুষকে তিনি কখনওই অমর্যাদা করেননি। সকলকেই মর্যাদা দিয়েছেন মানুষ হিসেবে।

একবার গ্রীষ্মকালের দুপুরে একজন ধনী মানুষের ঘরে কিছু উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে জাজিমে, টানা পাখার নিচে বসে তিনি আলোচনা করছিলেন। একজন দারোয়ান বিদ্যাসাগরের জন্য চিঠি নিয়ে সেখানে এসেছে। প্রখর রোদে হেঁটে এসেছে, শরীর ঘামে ভেজা। বিদ্যাসাগর দারোয়ানকে টানা পাখার নিচে জাজিমে নিজের পাশে বসতে বললেন। বড় মানুষদের পাশে দারোয়ানের বসার সাহস হল না। দাঁড়িয়েই থাকল। বিদ্যাসাগর তখন দারোয়ানকে হাত ধরে জাজিমে বসিয়ে দিলেন। খানিক ঠাণ্ডা হয়ে দারোয়ান চলে গেল। যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা বিদ্যাসাগরকে বললেন—'আমরা যে আসনে বসে আছি সেখানে একজন দারোয়ানকে বসিয়ে আপনি ভাল করেননি। এতে আমাদের মান থাকে না।'

বিদ্যাসাগর বললেন—'আগে বিচার হোক, পরে আমাকে দোষী ক'রো। বিচার কী মতে হবে? হিন্দুমতে না অন্য মতে? হিন্দু মতে বিচার শোন— এই দারোয়ান একজন কনৌজি ব্রাহ্মণ, ওরা আমাদের জল স্পর্শ করে না। তোমার বাপ-ঠাকুর্দা আজ এখানে থাকলে ওর পায়ের ধূলো এই জাজিমে না পড়ে তাঁদের মাথায় উঠত। অন্য মতে বিচার শোন, আমরা সকলে পাঁচশো, সাতশো, হাজার টাকা মাইনে পাই, ওই দারোয়ান পাঁচ টাকা মাইনে পায়। এ অবস্থায় আমি ওকে অবজ্ঞা করতে পারি না, কারণ আমার বাবা বড়বাজারে এক দোকানে পাঁচ টাকা মাইনের কাজ করতেন। ওকে অবজ্ঞা করার আগে আমার বাবাকে অবজ্ঞা করতে হয়। হয়তো এখন আমাদের মধ্যে এখানে কেউ কেউ আছেন যাঁদের বাবা কিংবা ঠাকুর্দা পাঁচ টাকা মাইনের কাজ করতেন।'

বিদ্যাসাগর ছিলেন অসহায় বিপদগ্রস্ত মানুষের বন্ধু। যে কেউ বিপদে পড়লেই তাঁর কাছে সাহায্যের আবেদন নিয়ে আসত। তিনি কাউকে ফেরাতেন না। দান করার ক্ষেত্রে ধর্মকে, জাতকে তিনি বিচারের মধ্যে ধরতেন না। সে সময় হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ্রিস্টান হয়েছিলেন। তাই আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি বিলাতে গিয়েছিলেন ব্যারিস্টারি পড়তে। সেখানে তিনি প্রচণ্ড আর্থিক সংকটে পড়েন। বিদেশে টাকার জন্য তাঁকে জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। নিরুপায় হয়ে মাইকেল বিদ্যাসাগরকে নিজের অবস্থার কথা জানিয়ে সাহায্যের আবেদন করেন। বিদ্যাসাগরের কাছে তখন এত টাকা নেই। কিন্তু মাইকেলকে তো বাঁচাতে হবে। ছ'হাজার টাকা ধার করে পাঠিয়ে দিলেন মাইকেলকে। এই পরিমাণ টাকা তখনকার দিনে বহু বড় জমিদাররাও দেওয়ার কথা ভাবতে পারতেন না।

মাইকেল বেহিসেবি খরচ করতেন। শোনা যায়, হাতে টাকা আসা সত্ত্বেও পরে বিদ্যাসাগরের ঋণ শোধ করেননি। এ জন্য বিদ্যাসাগরকে বিপদে পড়তে হয়েছে। তবু রাগ করেননি।

কেউ যদি বলতেন, 'মাইকেল তো আপনার ঋণ শোধ করল না?'

তিনি হেসে উত্তর দিতেন, 'মাইকেল কাব্য-সাহিত্যে জন্মভূমির অনেক ঋণ শোধ করেছেন— আমার ঋণ আর কতটা।'

কেউ কেউ এসে বলতেন, 'মাইকেলের মতো কোনও মাতাল সাহায্য চাইতে এলে আপনি সাহায্য করবেন তো?'

তিনি উত্তর দিতেন— 'না'।

কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতেন—'সে যদি মাইকেলের মতো একটা মেঘনাদবধ কাব্য লিখে আনতে পারে তা হলে সাহায্য করব।' বলতেন— 'আমি বাংলার কবিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মাইকেলকে সাহায্য করেছি।'

এরকম কত লোককে যে তিনি সাহায্য করতেন তার ইয়ত্তা নেই। বহু দরিদ্র, অসহায় মানুষ তাঁর কাছ থেকে মাঝে মাঝে সাহায্য পেতেন। বহু দরিদ্র ছাত্র তাঁর সাহায্যে পড়াশোনা করে জীবনে বড় হয়েছেন।

জলধর সেন গ্রামের ছেলে। বৃত্তি পেয়ে পাশ করেছে। কিন্তু কলকাতায় থেকে লেখাপড়া করার সাধ্য নেই। খুবই গরিব। সবাই পরামর্শ দিল, সে যদি একবার বিদ্যাসাগরকে গিয়ে বলে তা হলে তাঁর লেখাপড়ার ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। জলধর সেন বিদ্যাসাগরের কাছে এলেন।

ব্যিদাসাগর জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরে, কী চাস তুই?'

জলধর বললেন— 'আমি স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করেছি। আমরা খুব গরিব। কলকাতায় পড়ার পয়সা নেই। তাই আপনার কাছে এসেছি কলেজে বিনা বেতনে পড়তে পারব বলে।'

মেট্রোপলিটন কলেজ বিদ্যাসাগরের নিজস্ব কলেজ। সে কলেজে তখন জায়গা নেই। তিনি নিজে খরচ দিয়ে অন্য জায়গায় ভর্তির ব্যবস্থা করে দিলেন জলধরকে। পরবর্তীকালে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন জলধর। সারা জীবন বিদ্যাসাগরের অবদান ভুলতে পারেননি।

একবার শীতের রাতের বিদ্যাসাগর কলকাতার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। শীতের ঠাণ্ডা রাত। দেখলেন, সেই সময় কয়েকটি মেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছেন। এই মেয়েরা যে অভাবের জ্বালায় রোজগারের আশায় এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে তা তিনি জানতেন। এই পতিতাদের অসহায় দুঃখময় জীবনের প্রতি তাঁর ছিল অসীম করুণা।

তিনি তাঁদের কাছে গিয়ে বললেন—'মায়েরা, এই টাকা নাও, তোমাদের নিজের নিজের ঘরে যাও। এই ঠাণ্ডায় আর এখানে অপেক্ষা কোর না।'

কৃতজ্ঞতায় মেয়েগুলির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। একজন তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল— 'আপনি দেবতা। আমরা পাপী, তবু আমাদের উপর আপনার এত দয়া কখনও ভুলতে পারব না।'

(চলবে)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

মহান ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস স্মরণে

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের ১২৪তম স্মরণ বার্ষিকী উপলক্ষে ১২ আগস্ট দলের কেন্দ্রীয় অফিসে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পলিটবুরো সদস্য কমরেড শঙ্কর সাহা। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞান প্রতিবাদে রাজপথে বিজ্ঞানী, গবেষক ও ছাত্ররা

ভারত সহ সব পুঁজিবাদী দেশগুলিতেই বিজ্ঞান শিক্ষা আজ চূড়ান্ত অবহেলিত। বিজ্ঞান শিক্ষায়, গবেষণায় এক দিকে অর্থবরাদ্দ কমানো হচ্ছে, অন্য দিকে বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞানের চর্চা চলছে। এর বিরুদ্ধে ২০১৭ সালের ৯ আগস্ট সারা বিশ্বের বিজ্ঞানী-গবেষক সমাজ 'গ্লোবাল মার্চ ফর সায়েন্স'-এর ডাক দিয়েছিলেন। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি গবেষণায় আরও অর্থ বরাদ্দ এবং অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ও ছদ্ম-বিজ্ঞানের প্রসার বন্ধ করতে হবে— এই দুটি দাবি নিয়ে বিজ্ঞান জগতের বিশিষ্টরা পা মিলিয়েছিলেন মিছিলে। তারই ধারায় ইন্ডিয়া মার্চ ফর সায়েন্স গত দু' বছরের মতো এবারও ৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত হল বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানী সহ দেশের ৭০টি শহরে।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মন্ত্রীরা, দলের নেতারা নানা সময়ে বলেছেন, গরু অক্সিজেন ছাড়ে, গণেশের ঘাড়ে হাতির মাথা প্রাচীন ভারতে প্লাস্টিক সার্জারির প্রমাণ, গোমূত্র ক্যান্সারের প্রতিষেধক। তাঁরা আরও বলছেন, ডারউইন তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা নেই। তাঁরা যুক্তিবাদের পরিবর্তে বিশ্বাসকেই ভিত্তি করছেন, যা বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণার বিরোধী। এ সবের প্রতিবাদে এদিন রাজ্যের কলকাতা ও শিলিগুড়ি সহ নানা শহরে 'মার্চ ফর সায়েন্স' হয়। কলকাতার রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত বিভিন্ন দাবি সংবলিত সুসজ্জিত মিছিলে নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আসা দেড় হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী-গবেষক-বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন। মিছিল শেষে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেওয়া হয় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে।

গণমুক্তির সংকল্প উচ্চারিত হল

ছয়ের পাতার পর

গিয়েছে। এই ভাবে কংগ্রেস দেশে ফ্যাসিবাদের যে জমি প্রস্তুত করেছে তার সুযোগেই আজ বিজেপির মতো একটি চরম সাম্প্রদায়িক ও ফ্যাসিস্ট শক্তি ক্ষমতা দখল করতে পেরেছে এবং জনগণের উপর ফ্যাসিবাদী আক্রমণকে আরও তীব্র করে তুলেছে। নামেমাত্র যতটুকু গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক অধিকার, ব্যাক্তিস্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ছিল তা সবই আজ কেড়ে নিচ্ছে।

ফলে একথা আজ পরিষ্কার, পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এদেশের সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েরা হাজারে হাজারে প্রাণ দিয়ে জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করে, কারা রুদ্ধ হয়ে, অসহ্য দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করে স্বাধীনতার যে স্বপ্ন দেখেছিল তা অর্জিত হয়নি। সত্যিকারের গণমুক্তি আসেনি। এ কথাও আজ স্পষ্ট, পুঁজিপতি শ্রেণিরই রাজনৈতিক ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা কংগ্রেস-বিজেপির মতো বুর্জোয়া দলগুলির শাসনে সত্যিকারের গণমুক্তি আসতে পারে না। আজ তার জন্য প্রয়োজন একটি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পুঁজিবাদী এই শাসনের বিরুদ্ধে সেই ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মতো করে জনগণের সর্বাত্মক সংগ্রাম গড়ে তোলা। তার জন্য একদিকে প্রয়োজন নেতৃত্বদানে যোগ্য সেই যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টিকে চিনে নেওয়া, অন্য দিকে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা, উন্নত নীতি নৈতিকতার ভিত্তিতে সংগ্রামী চরিত্র গড়ে তোলা। ভারত ছাড়ো আন্দোলন এবং ১৫ আগস্ট গণমুক্তি সঙ্কল্প দিবস সেই আহ্বান নিয়েই আজ দেশের মানুষের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

এন এম সি বিরোধী অ্যাকশন ফোরাম গঠন করলেন চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরা

কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা এমসিআই ভেঙে দিয়ে মেডিকেল শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা ধ্বংসকারী অগতান্ত্রিক এনএমসি বিল চালুর প্রতিবাদে ১০ আগস্ট কলকাতার মৌলালি যুব কেন্দ্রে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার ও সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের আহ্বানে চিকিৎসক-মেডিকেল ছাত্রছাত্রী-সাধারণ মানুষের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য চিকিৎসক, রাজ্যের প্রায় প্রতিটি মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রী ও বিশিষ্টজনেরা।

স্বাস্থ্য আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ডাঃ অশোক সামন্ত, প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, প্রখ্যাত আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্র, সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এনএমসি বিল চালু হলে মেডিকেল শিক্ষার স্বাধিকার নষ্ট হবে, সার্বিক বেসরকারিকরণের সিংহদুয়ার খুলে যাবে, চিকিৎসকদের মান নিম্নগামী হবে, চিকিৎসার খরচ বাড়বে এবং চিকিৎসার মানও ক্রমশ নিম্নমুখী হবে সে ব্যাপারে সকলেই একমত হন। কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশ জুড়ে চিকিৎসক সমাজের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংসদের উভয় কক্ষে যেভাবে এনএমসি বিল পাশ করিয়ে নিল সেটা অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী, বক্তারা তাকে তীব্র ধিক্কার জানান। বক্তারা দাবি করেন যে বিলটি পাশ হয়ে আইনে পরিণত হলেও মেডিকেল শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের পরিপন্থী এই বিল অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে এই কনভেনশন থেকে 'অ্যাকশন ফোরাম এগেনস্ট এনএমসি' নামক একটি প্ল্যাটফর্ম গঠিত হয়। এই ফোরামের যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত হন ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র এবং ডাঃ অর্চিস্মান ভট্টাচার্য। এই রাজ্য সহ সারা দেশ জুড়ে এনএমসি-র বিরুদ্ধে জনমত গঠন এবং লাগাতার তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করে এই ফোরাম।

আগুনে সর্বস্ব হারানো মানুষের পাশে যুবকেরা

ধর্ম-বর্ণ-জাতপাত ভুলে বিপদের সময় এক মানুষের মতো দাঁড়ানোর নজির গড়ল মালদার হবিশ্চন্দ্রপুরের গাংনদীয়ার যুবকেরা। আগুনে সর্বস্ব হারানো এখানকার কয়েকটি পরিবারের হাতে তুলে দিল যথাসাধ্যে জোগাড় করা ত্রাণসামগ্রী।

৪ আগস্ট গভীর রাতে গাংনদীয়ার কিছু মানুষের সমস্ত কিছু চলে যায় ভয়াবহ আগুনের গ্রাসে। তাদের পাশে দাঁড়াতে পড়শি যুবক রাজিউল ইসলাম উদ্যোগ নেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে গ্রামের ছাত্র-যুবকদের মধ্যে মনতোষ সাহা, ইজাজ আহম্মেদ, সোয়েল আক্তার, নমরুদ আমি, মহম্মদ সুভানরা দু'দিন ধরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুর্গতদের জন্য ত্রাণ সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত ৮৫ কেজি চাল, ২৫ কেজি আলু এবং ১৫ কেজি পেঁয়াজ-রসুন দুর্গতদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

তাছাড়া সংগৃহীত নগদ অর্থে ৩টি শাড়ি, ৩টি গামছা সহ ৬ প্যাকেট বিস্কুট, ১৫টি গায়ে মাখা সাবান, ১৫টি কাপড় কাচা সাবান, ৩ কেজি ডিটারজেন্ট, ৩ কেজি মুসুর ডাল, ১ কেজি সোয়াবিন, ৬ প্যাকেট চানাচুর, ৩ কেজি লবণ, ৩ লিটার সরষের তেল, ৩টি টুথপেস্ট তুলে দেওয়া হয় দুর্গত পরিবারের সদস্য মহবুল, দুলাল, তারাদের হাতে। এই কর্মসূচির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মুসারফ, সৌকত, জিশান, মনোতোষ, এজাজ, সুভান, নমরুদ, সোয়েল, রবিউল, পাতালু সহ গ্রামের একদল দায়িত্বশীল যুবক। যুবকেরা সাহায্য দিতে এগিয়ে আসা গ্রামের সকল সহৃদয় ব্যক্তিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com